ভূমিকা

মানুষ যে সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় তার মধ্যে হাসি অন্যতম। আলঙ্কারিকেরা মানবচিত্তে যে নয়টি স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে হাস্ ভাব একটি। এই হাস্ ভাব থেকেই হাসির জন্ম হয়। মানব সভ্যতার বিকাশের আদি স্তর থেকেই মানুষ হাসতে শিখেছে। সভ্যতার বিবর্তনে যেদিন থেকে সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও হাসি সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রচ্ছন্নভাবে হলেও একথা বলতে হচ্ছে এ কারণেই যে প্রথম অবস্থায় পৃথিবীর কোন দেশের সাহিত্যেই হাস্যরসের প্রবেশ অবাধ ছিল না। সাহিত্যগুরু অ্যারিষ্টটল হাসি রঙ্গ-ব্যঙ্গকে খুব উঁচুতে স্থান দেননি। তিনি হাস্যরসকে নিম্ন রুচির প্রকাশ বলেই মনে করতেন। যদিও তিনি একে অস্বীকার করেননি। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যও শত শত ব্যঙ্গ রচনায় সমৃদ্ধ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বড়াই, 'চন্ডীমঙ্গলে'র ভাড়ুদত্ত অথবা মুরারী শীল হাস্যরসিক চরিত্র হিসেবে পাঠকের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। এ কথা ঠিক যে আধুনিক যুগের আগে পর্যন্ত হাস্যরস সাহিত্যের আসরে তেমন দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু আধুনিক যুগ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আসরে হাস্যরস একটি বড় জায়গা অধিকার করে বসেছে। তবে এই হাস্যরস আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মত নয়। আধুনিক লেখকেরা হাস্যরসের ধারণায় একটি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এলেন। আধুনিক লেখকেরা প্রায় সকলেই মনে করেন উচ্চস্তরের হাস্যরস বিদ্রূপ বা আঘাত দিয়ে আত্মতৃপ্তি বা সাময়িক আনন্দলাভের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে না। জীবনের প্রতি ভালোবাসা, দরদ, প্রীতি ও সহানুভূতির সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি নির্দেশ করেই যথার্থ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন থেকে শুরু করে দীনবন্ধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই হাস্যরসকে এভাবে দেখেছেন। বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের তিন শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তবে জীবনদৃষ্টি, উপস্থাপন কৌশল, শিল্পগত নৈপুণ্য সকলের একই রকম নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এর রকমফের হতে বাধ্য। এই পার্থক্যের জন্যই একই রসের কারবারি হয়েও প্রতিটি লেখক ভিন্ন মর্যাদার অধিকারি। বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের তিন প্রধান শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় একই হাস্যরসের কারবারি হয়েও কীভাবে স্বতন্ত্র আসনের অধিকারি তা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে।

সাহিত্যে হাস্যরসের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের ভান্ডার খুব সমৃদ্ধ না হলেও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে হাস্যরসের উল্লেখ রয়েছে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে যে নয়টি রসের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে হাস্যরস একটি। ভরতমুণি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' বলেছেন :

''শৃঙ্গার-হাস্য-করুণা রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসা স্মৃতাঃ।।''[১]

—এখানে শান্তরসের উল্লেখ নেই। ভরতমুণি শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত নামক আটটি রসের আটটি স্থায়ী ভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই আটটি স্থায়ী ভাব হল :

''রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।''[২]

- নাট্যশাস্ত্র, ৬/ ১৮

পাশ্চাত্য সাহিত্যেও হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের ভান্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। মানব জীবনে হাসি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে অনায়াসেই তা সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে হাসতে জানে। তাই বলা হয় 'Man is a laughing animal'. অর্থাৎ মানুষ হাস্যময় প্রাণী। তবে মানুষের হাসি কিন্তু অকারণ নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে মানুষ হেসে ওঠে। হাসির মূল কারণ যে অসঙ্গতি একথা প্রায় সকল হাসির ভাষ্যকারগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে এ অসঙ্গতিরও পার্থক্য রয়েছে। হাসির ভাষ্যকারগণ বিভিন্নভাবে এই অসঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। ইংরেজ জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক Herbert Spencer (১৮২০-১৯০৩) হাসির কারণ হিসেবে অসঙ্গতির কথা বলেছেন। ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ Sully (১৮৪২-১৯২৩) অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন নতুনত্বের মধ্যে। ইংরেজ সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচক William Hazlitt (১৭৭৮-১৮৩০) অসঙ্গতিকে দেখেছেন প্রত্যাশিত ঘটনাপ্রবাহের বাধাপ্রাপ্তির প্রসঙ্গে। আবার ফরাসী দার্শনিক Henri Bergson অসঙ্গতিকে আবিষ্কার করেছেন সজীব প্রাণের মধ্যে নির্জীবতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে। যে যে অবস্থায় মানুষ হাসে মোটামুটিভাবে সেগুলি হল :

১) অদ্ভুত, উদ্ভট ও বিস্ময়জনক ঘটনা অথবা চরিত্র দেখে মানুষ হাসে।

২) অসঙ্গত, বিসদৃশ ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা চরিত্র প্রত্যক্ষ করে অনেক সময় মানুষের হাসি পায়।

৩) অন্যের দৈহিক বিকৃতি দেখেও মানুষের হাসি আসতে পারে। এ বিষয়ে Bergson বলেছেন :

> "A deformity that may become comic is a deformity that a normally built person could successfully imitate."[৩]

অর্থাৎ যে দৈহিক বিকৃতি অনুকরণীয় সে বিকৃতিই বিশেষভাবে হাস্যোদ্দীপক।

৪) চরিত্রের দোষত্রুটি লক্ষ করেও মানুষ হাসে। অবশ্য এই দোষত্রুটিরও একটি মাপকাঠি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে Dr.Sully বলেছেন :

> ‘‘In the case of what are palpable vices we have counteractive tendencies, not merely the finer shrinking from the ugly, but the social or the moral sense in the distressed attitude of reprobation. Hence it may be said that the immoral trait must not be of such volume and gravity as to call forth the moral sense within us."[৪]

অর্থাৎ Sully বলতে চেয়েছেন যে চরিত্রের দোষত্রুটির একটি মাত্রা পর্যন্তই হাস্যরস উদ্রেক করে। কিন্তু সেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই অর্থাৎ দোষ গুরুতর হয়ে উঠলেই তা মানুষের মনে ঘৃণা ও নৈতিক বোধ জাগ্রত করে।

৫) মানুষের কার্যাবলীর পৌনঃপুনিকতা অনেক সময় হাসির উদ্রেক করে।

৬) বিপরীত স্বভাববিশিষ্ট কিছু দেখেও মানুষ হাসে।

যে যে কারণের জন্য মানুষ হাসে সে বিষয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। প্রথমেই পাশ্চাত্ত্য পন্ডিতদের মত উল্লেখ করা যেতে পারে :

ক) ইংরেজ দার্শনিক Thomas Hobbes তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Leviathan'-এ হাসির কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন :

> "Sudden glory is the passion which maketh those grimaces called laughter; and is caused by some deformed thing in another by comparison where of they suddenly appland themselves. And it is incident most to them, that are conscious of the fewest abilities themselves; who are forced to keep themselves in their won favour, by observing the imperfections of other men. And therefore much laughter at the defect of others, is a sign of pusillanimity. For of great minds, one of the proper work is to help and free others from scorn; and compare themselves only with the most able."[৫]

খ) Bergson মনে করেন, মানুষ মানুষের ছোটখাটো অসঙ্গতি বা বিকৃতিকে হাসির দ্বারা সংশোধন করতে চায় বলে হাসে।[৬]

গ) জার্মান দার্শনিক Immanuel Kant (১৭২৪-১৮০৪) বলেছেন :

> "An affection arising from the sudden transformation of a strained expectation into nothing."[৭]

অর্থাৎ অত্যধিক প্রত্যাশা যখন কিছু না'তে পরিণত হয় তখন মানুষ হাসে।

ঘ) আমেরিকান দার্শনিক William McDougall (১৮৭১-১৯৩৮)-এর মতে :

> ''অতিস্পর্শকাতরচিত্ত মানুষ, জীবনের ছোটখাটো অসঙ্গতি ও বিকৃতির বেদনাতরঙ্গ থেকে সমবেদনাপ্রবণ চিত্তকে মুক্ত রাখার জন্য তথা জীবনকে বিষাদ-রোগ থেকে মুক্ত রেখে মানুষ্য প্রগতির সুষ্ঠু অভিযোজন সুরক্ষিত করবার জন্যই, হাসি দ্বারা বেদনার তরঙ্গকে লঘু ও অপসারিত করবার জন্য হাসে।''[৮ক]

একথা মনে রাখতে হবে যে জীবনের হাসি ও সাহিত্যের হাসি কিন্তু এক নয়। সাহিত্যের হাসিকে রসযুক্ত হতেই হয়। কাতুকুতু দিলেও তো মানুষ হাসে কিন্তু সে হাসি কখনো সাহিত্যের হাসি নয়। কেননা সে হাসির সঙ্গে রস যুক্ত হয় না । দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতে :

> ''প্রকৃত হাস্যরস মানুষের মানসিক দৌর্ব্বল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্দ্ধ-বধির ব্যক্তি প্রশ্ন শুনিতে না পাইয়া যদি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করে ''এ্যাঁ'', তাহা সেই বধিরের শারীরিক বৈকল্য মাত্র; তাহা যদি কাহারও হাস্যের কারণ হয়, ত সে হাস্য একটা রস নহে। সে হাস্য এক জনকে পিছলাইয়া পড়িতে দেখিয়া হাস্য একই প্রকারের। কিন্তু সে বধির ব্যক্তি যদি প্রশ্ন শুনিতে না পাইয়া কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর দেয়, ত তাহাতে যে হাস্যের উদ্রেক হয়—তাহা রস। কেননা, তাহার মূলে বধিরের মানসিক দৌর্ব্বল্য—অর্থাৎ আপনাকে বধির বলিয়া স্বীকার করিতে তাহার অনিচ্ছা।
>
> মনুষ্যহৃদয়ে যে সকল দৌর্ব্বল্য আছে, তাহার অসঙ্গতি দেখাইয়া হাস্যের উদ্রেক করিলে, সেই দৌর্ব্বল্যর প্রতি আক্রোশে ব্যঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিতে মৃদু পরিহাসের সৃষ্টি হয়।''[৮খ]

জীবনের ক্ষেত্রে শান্তরসেও হাসি সঞ্জাত হতে পারে। সন্তানের কৃতিত্ত্বে মাতা-পিতার মনে যে স্মিত হাসির রেখা দেখা দেয় তা কিন্তু সাহিত্যের হাস্যরসের বিষয়ীভূত নয়। মানুষের মনে স্থায়ীভাব রূপে যে হাস্ ভাব থাকে তা বিভাব-অনুভাবাদির সাহায্যে হাস্যরসের উদ্ভব ঘটায়। সাধারণভাবে মানুষের জীবনে হাসি আসতে পারে কিন্তু সেই হাসি হাস্যরস নয়। কেননা

অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী সেই রসকে পাঠকের অন্তরে গিয়ে আস্বাদ্যমান হতেই হয়। সেই হিসেবে হাস্যরসকেও পাঠকের অন্তরে গিয়ে আস্বাদ্যমান হতে হয়। মানুষের অন্তরে স্থায়িভাব রূপে থাকা হাস্‌ভাব বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সহযোগে যখন কাব্যে পরিবেশিত হয় অর্থাৎ লৌকিক হাস্‌ভাব যখন কাব্যের আস্বদ্যমানতা প্রাপ্ত হয় তখনই তাকে হাস্যরস বলে অভিহিত করা যায়। অধ্যাপক বিজন বিহারী ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলেন :

> ''হাস্যরসের মধ্যে আছে কৌতুকের প্রধান্য। যে হাসির মূলে কৌতুক নাই তাহা আর যে রসেরই উদ্রেক করুক না কেন, হাস্যরসের উদ্রেক করতে পারে না।''[৯]

কৌতুক জিনিসটা কি? আনন্দ ও কৌতুক কিন্তু এক নয়। অথচ আমরা সুখেও হাসি আবার কৌতুকেও হাসি। পুত্রের চাকরী লাভের খবর শুনে পিতার মনে যে অনুভূতি হয় তাকে আমরা বলতে পারি সুখ এবং সেই সুখে আমরা হাসি। আর কৌতুক কাকে বলব? একজন মোটা মানুষ চৌকি ভেঙ্গে পড়ে গেলে আকস্মিকভাবে আমাদের মনে যে হাসির অনুভূতি হয় সেই অনুভূতিকে আমরা বলতে পারি কৌতুক। সুখ ও কৌতুকের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি উদাহরণ দিয়েছেন :

> '' ''তৃষার্ত হইয়া চাহিলাম এক ঘটি জল।
> তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখান বেল।।''
>
> তৃষার্ত ব্যক্তি যখন একঘটি জল চাহিতেছে তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া আধখানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তির তাহাতে আমোদ অনুভব করিবার কোন ধর্মসংগত অথবা যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনা-মতে তাঁহাকে একঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদনাবৃত্তি-প্রভাবে আমরা সুখ পাই—কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না কী বৃত্তি-প্রভাবে, আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়।''[১০]

—সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হয় সুখ ও কৌতুক এক নয়, যদিও উভয়ের প্রকাশ হাসির মাধ্যমেই।

সাহিত্যের হাসিতে কৌতুক থাকতে হয়। কৌতুকের উৎপত্তি হয় অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি থেকে। সম্ভাব্য এবং সংঘটিত—এই দুইয়ের মধ্যে যখন মিল হয় না তখন তা কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিজন বিহারী ভট্টাচার্য এই কৌতুকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন :

> '' কৌতুক হইতে যে সুখের উৎপত্তি হয় তাহাকে ঠিক আনন্দ বলা চলে না। তাহাকে আমোদ নাম দিলেই সঙ্গত হয়। আনন্দে স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু আমোদে আছে

উত্তেজনা। এই উত্তেজনার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার কিছু না কিছু যোগ আছে। কৌতুকের মধ্যে নিষ্ঠুরতার নিদর্শন সুস্পষ্ট।''[১১]

সুতরাং একথা বলা যায় যে কৌতুকের সঙ্গে একদিকে অসঙ্গতি ও অন্যদিকে নিষ্ঠুরতার যোগ আছে। কৌতুকের সঙ্গে অসঙ্গতি ও নিষ্ঠুরতার যোগ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

''কৌতূহল জিনিসটা অনেকস্থলে নিষ্ঠুর; কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে। সিরাজদ্দৌলা দুইজনের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য পুরিয়া দিতেন এইরূপ প্রবাদ শোনা যায়—উভয়ে হাঁচিতে আরম্ভ করিত, তখন সিরাজদ্দৌলা আমোদ অনুভব করিতেন। ইহার মধ্যে অসংগতি কোন্‌খানে? নাকে নস্য দিলে তো হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্যের অসঙ্গতি। যাহাদের নাকে নস্য দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারণ হাঁচিলেই তাহাদের দাঁড়িতে অকস্মাৎ টান পড়িবে। কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতে হইতেছে। এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি, এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে।''[১২]

কৌতুকের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা আছে সেই নিষ্ঠুরতা আসে নিয়মভঙ্গ থেকে।

কৌতুক ও আমোদের মধ্যেও পার্থক্য আছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তিনি বলেছেন :

''নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিসটা নিত্য নৈমিত্তিক সহজ নিয়মসংগত নহে; তাহা মাঝে মাঝে এক -এক দিনের; তাহাতে প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে -একটা উত্তেজনা হয় সে উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।''[১৩]

একথা স্বীকার করতেই হবে যে অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য বা নিয়মভঙ্গের পরিমাণ বা মাত্রার দিকটি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এদের পরিমাণ বা মাত্রাগত কমবেশির উপর হাসির প্রকৃতি নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'' অর্থাৎ অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়। শিকারী যখন অনেকক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলি বর্ষণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা একটা ছিন্ন বস্ত্রখন্ড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায়; কিন্তু কোন লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থ মনে করিয়া একাগ্র চিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্মকাল তাহার অনুসরণ

করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনা মাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়।''[১৪]

তাই তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান :

''স্থূল কথাটা এই যে, অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।''[১৫]

হাস্যোদ্দীপকতা নিহিত থাকে সে জাতীয় বিকৃতি বা কুৎসিতের মধ্যে যা আমাদের মধ্যে কোন বেদনা বা ভয়ের সঞ্চার করে না। অ্যারিষ্টটল কমেডির আলোচনা প্রসঙ্গে হাস্যোদ্দীপকের সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন :

" It consists in some defect or ugliness which is not painful or destructive." [১৬]

কেননা সাধারণভাবে বিকৃতি দেখে মানুষের মনে বেদনাবোধ ও কদাকার কোন কিছু দেখে মানুষের মধ্যে প্রাণনাশের আশঙ্কা জেগে ওঠে। কিন্তু সেই বিকৃতি বা কুৎসিত আকৃতিই মানুষের মধ্যে হাস্যরসের সঞ্চার করে। সেক্ষেত্রেও মানুষ সমবেদনা ও ভয়ের ভাব নিয়ে বিকৃতি বা কদাকারকে দেখে না। সমবেদনা বা ভয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে বিকৃতি বা কদাকার মানুষের মনে হাসির বদলে বেদনা অথবা ভয় ভাব জাগাত। আবার সমবেদনার অভাবে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে গেলে ক্রোধ বা ঘৃণার উদ্রেক ঘটে।

হাস্যরসের শ্রেণী :

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক ও দার্শনিকেরা হাস্যরসের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা বলেছেন। এগুলি হল :

কৌতুকরস (Fun) : একধরণের হাসি আছে যার অবস্থান হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে নয়, মনের উপরিতলে এবং যার আবেদন মানুষের অনতিগভীর স্তরে সেই ধরণের হাসিকে বলা হয় কৌতুক বা fun. বিকৃত অঙ্গভঙ্গী, সামান্য বস্তুতে দার্শনিকতার আবিষ্কার, ঘটনার অতিরঞ্জন প্রভৃতি এই ধরণের হাসির উৎস। ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন :

'' কৌতুকময় হাস্যরসের মধ্যে উদ্ভট ও অস্বাভাবিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ থাকে। যাহা সহজেই মনকে ধাক্কা দিয়া সচকিত ও আমোদিত করিয়া তোলে তাহাই এই হাস্যরসের প্রাণ।''[১৭]

এই হাসিকে মানুষের স্বাভাবিক হাসি বলা যেতে পারে। এই হাসিই মানুষের মধ্যে প্রথম উৎপত্তি লাভ করেছে। মানুষের সভ্যতা যত বিবর্তন লাভ করেছে ততই মানুষের হাসির সঙ্গে

চিন্তাশীলতা যুক্ত হয়েছে এবং হাসি উদ্দেশ্যমূলক হয়ে পড়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের হাস্যরসের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

হিউমার (Humour) : হিউমার শব্দটির একটি ইতিহাস আছে। সঠিক অর্থে এর অর্থ হল একটি শারীরিক রস। মধ্যযুগের চিকিৎসকেরা মনে করতেন যে মোট চারটি প্রধান রস বা হিউমার রয়েছে শরীরে। এই চারটি শারীরিক রস হল—রক্ত, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও কৃষ্ণমেহ। এই চারটি শারীরিক রস কি অনুপাতে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে তার উপর নির্ভর করে একজন মানুষের শারীরিক ও মানসিক গুণাবলী। 'A Dictionary of Modern Critical Terms` গ্রন্থে Humour বিষয়ে বলা হয়েছে :

> ''In Medival medicine the four humours were the fluids whose dominance determined the nature (complexion) of men: Blood (sanguine); phelgma (phlegmatic); Choler (choleric); Black Choler or Bile (melancholic).''[১৮]

—হিউমার সম্পর্কে এই প্রাচীন ধারণা এখন আর গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু এখনো মানুষের বিশেষ মানসিক অবস্থা বোঝাতে Humour শব্দটিকে বোঝানো হয়। ইংরেজী সাহিত্যে রসিকতার যত রকম প্রকারভেদের কথা বলা হয় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিউমার। বুদ্ধির তীব্র দীপ্তি এই হাস্যরসেও থাকে তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয় সহানুভূতির করুণ শীতল স্পর্শ। ''হিউমারের হাসিতে মুখের হাসি ও চোখের জল মিশিয়া একপ্রকার অপূর্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।''[১৯]

হিউমার-এ বিদ্রূপ থাকলেও বিদ্রূপের জ্বালা থাকে না। তার পরিবর্তে থাকে একপ্রকার স্নেহ-মন্ডিত অনুযোগ। হিউমারের হাসিতে হিউমার স্রষ্টার সমাজ শোধনের প্রবল ইচ্ছা থাকলেও তা উচ্চকিত নয়, তা সহানুভূতির রসে সিক্ত অত্যন্ত কোমল। তাই হিউমারের আবেদন মানুষের কাছে খুব বেশী। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> ''Humour-এর গভীর আবেদনের (Appeal) একটা কারণ এই যে, ইহার পশ্চাতে একটা বিশিষ্ট মনোবৃত্তি, জীবন সমালোচনার একটা মৌলিক, গতানুগতিকতা বর্জনকারী ভঙ্গীর পরিচয় মেলে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে জীবনের যে সমস্ত বৈষম্য ও অসঙ্গতি সম্বন্ধে আমাদের মন অসাড়, অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার মধ্যে যে সমস্ত বিচার-বিভ্রম ও ভ্রান্ত মতবাদ অখন্ডনীয় সত্যের মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, humourist-এর হাসির খোঁচা একঝলকে অতর্কিত আলোকের মত সে সমস্ত ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিকে এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে এবং

আমাদের জীবনের বিচারধারাকে শোভন-অশোভন-নির্ধারণের মানদন্ডকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া দেয়। তাহার হাসির মধ্যে এই স্বচ্ছ, ভ্রান্তিবিলাসকারী আলোক-প্রাচুর্য আছে বলিয়াই ইহা আমাদিগকে এত গভীরভাবে স্পর্শ করে। Humourist তার হাসির সাহায্যে আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, যেখানে আমরা গম্ভীর সেখানে আমরা হাস্যাস্পদ, যাহা আমাদের নিকট উপহাস্য তাহা প্রকৃতপক্ষে সহানুভূতির অধিকারী। তিনি জীবনের প্রতি একটা বক্র, বঙ্কিমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রচলিত, ব্যবহারিক সত্যের অভ্যন্তরে অলক্ষিত, বিস্মৃত সত্যের আবিষ্কার করেন এবং এই আবিষ্কারের অতর্কিততত্ব ও আবিষ্কার প্রণালীর মৌলিকতা আমাদের চমক ভাঙাইয়া আমাদিগকে অসংবরণীয় হাস্যোচ্ছ্বাসে স্ফীত করিয়া তোলে।''[২০]

পাশ্চাত্য সাহিত্যে হিউমার নিয়ে সবথেকে প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন Thomas Carlyle. তিনি সত্যিকারের হিউমারকে 'a heavenly thing` (The Carlyle Encyclopedia, P-228)[২১ক] বলেছেন। হিউমারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন : ''Humour is a sympathy with the seamy side of things.''[২১খ] জীবনের অপ্রীতিকর অসুন্দর দিককে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে হাস্যরসাত্মকভঙ্গীতে তুলে ধরাই হিউমারিষ্টের কাজ। তিনি আরও বলেছেন :

''True humour springs not more from the head than from the heart; it is not contempt, its essance is love, its issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper.''[২২]

ইংরেজ ঔপন্যাসিক George Meridith তাঁর 'The Idea of Comedy' গ্রন্থে বলেছেন :

''The stroke of the great humourist is world wide with lights of Tragedy in his laughter.''[২৩]

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থে 'হাস্যরস ও হিউমার' প্রবন্ধে হিউমারের হাসি সম্পর্কে বলেছেন :

''জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা নির্লিপ্ত অথচ সহৃদয় মনোভাবই 'হিউমার'-এর মূল উৎস। জ্বালা, মর্ম্মপীড়া বা ন্যায়-অন্যায়বোধের আক্রোশ তো নহেই—কোন উচ্ছ্বাস বা অবসাদের অভিব্যক্তি খাঁটি হিউমার-এর লক্ষণ নয়। মানুষের সর্ব্ববিধ নির্বুদ্ধিতা,—তাহার অহঙ্কার, স্বার্থপরতা এবং বিশেষ করিয়া, ভাগ্যের পরিহাস-নিষ্ঠুর পীড়নে মানুষের যে চিরন্তন অসহায় অবস্থা—তাহার সম্বন্ধে অতিশয় ধীরবুদ্ধি ও আক্ষেপহীন মনোভাব রক্ষা করিয়া, সেই সকলের উপরে একটি লঘু-হাস্যের

আলোকপাত করার যে প্রতিভা বা রসবোধ, তাহা হইতে খাঁটি 'হিউমারের' উৎপত্তি হয়।''[২৪ক]

হাস্যরস নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'কালিদাস ও ভবভূতি' প্রবন্ধে একটি প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি হিউমার সম্পর্কে বলেছেন :

'' আর এক প্রকারের রসিকতা আছে, তাহা অতি উচ্চ ধরণের। তাহা মিশ্র রসিকতা। হাস্যরসের সঙ্গে করুণ, শান্ত, রৌদ্র ইত্যাদি রস মিশাইয়া যে রসিকতার সৃষ্টি হয়, তাহাকে আমি মিশ্র রসিকতা বলিতেছি। যে রসিকতা মুখে হাসি ফুটায়, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে জলধারা বহাইয়া দেয়, কিংবা যাহা পড়িতে পড়িতে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে হৃদয়ে আনুভব করি, তাহা জগতের সাহিত্যে অতি বিরল। কোন কোন সমালোচকের মতে Falstaff-এর চরিত্র চিত্রণে সেক্সপীয়রের রসিকতা এই শ্রেণীর''[২৪খ]

অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন :

'' হিউমার-এর হাসি প্রবল এবং উতরোল নহে, ইহা মৃদু এবং অনুচ্চ। হিউমারের হাসিতে আনন্দময় অন্তরের অবারিত উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। এই হাসির স্রোতের বিরুদ্ধে এক অন্ত:শায়ী বেদনার প্রতিকূল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই প্রতিকূল স্রোতের প্রতিক্রিয়ায় হাসির বেগ বাধাপ্রাপ্ত ও মন্দীভূত। হিউমার-এ আমরা হাসি বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর বেদনার সুতীক্ষ্ণ কন্টক সুতীব্রভাবে আমাদের অন্ত:করণ বিদ্ধ করিয়া দেয়। আমাদের বাহ্য হাস্যের প্রসন্ন দীপ্তি আন্তর বেদনায় গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসে।'' [২৫]

হিউমারিষ্ট জীবনকে দেখেন মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে। দূর থেকে দূরবীন দিয়ে তিনি এ জগৎ সংসারকে প্রত্যক্ষ করেন না। বরং পরম সহানুভূতি সম্পন্ন এক উদার মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই জীবনকে প্রত্যক্ষ করেন। হিউমারিষ্ট যাদের নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেন তিনি তাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন না। নিজেকে তাদেরই একজন বলে মনে করেন। তাদের অন্তরস্থিত বেদনায় তিনি ব্যথিত হন। এই সহমর্মিতার কারণেই হিউমারের হাসির অন্তরালে থাকে বেদনার স্রোত। হিউমারিষ্ট যে কোন মানুষের তুলনায় জীবনকে অনেক ব্যাপক ও হৃদয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হিউমারের হাসির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যেতে পারে :

১) হিউমারের হাসি উচ্চকিত নয়, মৃদু।

২) হিউমারের হাসির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে তীব্র সহানুভূতির মনোভাব।

৩) হিউমার শুধুই হাসি নয়, হাসি-কান্নার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

উইট (WIT) : একধরণের হাসি আছে যে হাসি মূলত: বুদ্ধিপ্রধান। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ ধরণের হাসিকে বলা হয় WIT. ইংরাজীতে উইট শব্দটির মূলগত অর্থ বুদ্ধি। এ হাসিতে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে বলে একে উইট বলা হয়। এর সৃষ্টি যেমন বুদ্ধিপ্রধান মস্তিষ্কে তেমনি এর আবেদন বুদ্ধিপ্রধান হৃদয়ে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ''wit হইতেছে বুদ্ধির তরবারি-খেলা, নি:সম্পর্কিত বস্তু বা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় অতর্কিত সাদৃশ্য-আবিষ্কার।''[২৬] অর্থাৎ উইট-এর সৃষ্টিকারী ও উইট-এর উপভোগকারী উভয়েই বুদ্ধির এমন একটি স্তরে অবস্থান করে যে সেই স্তর থেকে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটলেই উইট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ছোটবেলায় মাষ্টার মহাশয়ের কাছে শোনা বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি গল্পের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। সে গল্পটি হল একবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুল ইন্সপেক্টর থাকাকালীন কোন একটি স্কুলে পরিদর্শনে যান। বিদ্যাসাগর সেই স্কুলে উপস্থিত হওয়া মাত্রই স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় বেরিয়ে এসে তাকে আপ্যায়ন করেন এবং স্কুলের শোচনীয় পরিকাঠামোর কথা তাকে অবগত করতে গিয়ে বলেন **'দেখুন কি দুরাবস্থা'**। শব্দের সঠিক বানানটি হওয়া উচিৎ **'দুরবস্থা'**। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন **'সে তো আ কার দেখেই বুঝতে পারছি'**। এখানে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত কৌশলে ইঙ্গিত করলেন যে শোচনীয় অবস্থা শুধু স্কুলের পরিকাঠামোর নয় হেডমাষ্টারেরও। বিদ্যাসাগরের এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হাস্যরস প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তবে সেই হাস্যরসকে বোঝার জন্য চাই শিক্ষা ও বুদ্ধি। একমাত্র তবেই সেই হাস্যরসকে উপলব্ধি করা সম্ভব। সুতরাং উইট যে বুদ্ধিপ্রধান হাস্যরস একথা স্বীকার করতেই হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উইট-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

''wit-এ বুদ্ধির স্বচ্ছন্দ লীলা আমাদের চোখ ধাঁধাইয়া দেয় ও সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু ইহার কথা-লোফালুফির ও অদ্ভুত ব্যায়াম-কৌশলের মধ্যে কোন হৃদয়গত গভীর আলোড়নের স্পন্দন অনুভূত হয় না। ইহার ঘাত-প্রতিঘাতে কতকটা দ্বৈরথ-যুদ্ধের নির্মম শক্তিবিকাশের পরিচয় মিলে—ইহার আক্রমণে একপ্রকারের নিষ্ঠুরতা, মানুষের সুকুমার ভাবপ্রবণতার প্রতি একটা উদ্ধত ঔদাসীন্যের সুর ধ্বনিত হয়।''[২৭]

ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন :

''উইট ভাসমান মেঘের একমুখী প্রবাহ নহে, ইহা বিপরীতমুখী মেঘের সঘন সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের ফলে সুতীব্র বিদ্যুতের শাণিত দীপ্তি চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।

বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং শিক্ষা সাপেক্ষ বলিয়া ইহার আবেদন স্বত:স্ফূর্ত নহে। দ্বিতীয়বার চিন্তার পর ইহার মর্ম বোধগম্য হয়। উইট লেখক উদ্ভট ও অসম্ভব বাক্যবর্ষণের দ্বারা আমাদিগের চিন্তা ও বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, আমরা যখন অর্থ বাহির করিতে হাতরাইয়া মরি, তিনি তখন দূর হইতে মৃদু হাসির সহিত মজা দেখিতে থাকেন।''[২৮]

পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচক ও পন্ডিতেরা অনেকেই উইট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। M.H Abrams তাঁর 'A Glossary of Literary Terms' গ্রন্থে বলেছেন :

"Wit once meant the mental faculty of intelligence or inventiveness a sense it still retains in the term' half- Wit.``[২৯]

অর্থাৎ তিনি উইট বলতে বুদ্ধিনির্ভরতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন।

K.Fischer wit বোঝাতে গিয়ে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টিকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

" The judgment which produces the comic contrast is wit... wit is playful judgement, wit is nothing but a free play of ideas.``[৩০]

Wit সম্পর্কিত আলোচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন অস্ট্রিয়ান মনস্তত্ত্ববিদ Sigmund Freud. 'Wit and its relation to the Unconscious` নামক গ্রন্থে Freud উইট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন :

''Wit has remained true to its nature from begining to end. It begins us play in order to obtain pleasure from the free use of words and thoughts.``[৩১]

Freud এখানে শব্দ ও ভাবের যথেচ্ছ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আনন্দ সৃষ্টি করার কথা বলেছেন। এছাড়াও তাঁর মনে হয়েছিল:

''পরপীড়নেচ্ছু লোকেরা উইট সৃষ্টি করিয়া অন্যকে আঘাত দিতে বিশেষ পটু ও সক্ষম হইয়া থাকে। তাঁহার মতে উইটের মধ্য দিয়া আমরা আমাদিগের শত্রুকে হাস্যাস্পদ করিয়া আমোদ অনুভব করি।''[৩২]

হাস্যরসের একটি বিশিষ্ট শ্রেণী হিসেবে উইটের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত: আপাত প্রত্যক্ষগোচর বস্তুর অন্তরালে যে ত্রুটি প্রচ্ছন্ন থাকে উইট কথার এক মোচরে তাকেই গোচরীভূত করে। হয়তো একারণেই K.Fischer বলেছেন যে ''Wit must unearth something hidden and concealed.``[৩৩]

দ্বিতীয়ত: উইটে সর্বত্র বুদ্ধির প্রাধান্য।

তৃতীয়ত: উইট জীবনের কোন গভীর তাৎপর্যকে তুলে ধরে না বরং জীবনের কোন খন্ড অংশের মধ্যে যে গভীর অসঙ্গতি লুকিয়ে থাকে তাকেই রসিকতার সুরে তুলে ধরে।
চতুর্থত : উইট বিরুদ্ধধর্মী বাক্যের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।

হিউমারের হাসির সঙ্গে উইটের হাসির পার্থক্য হল :

প্রথমত: উইট-এ বুদ্ধির প্রাধান্য, অন্যদিকে হিউমারের হাসিতে বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে সহানুভূতির করুণ শীতল স্পর্শ মিশ্রিত হয়।
দ্বিতীয়ত: উইট সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে, আর হিউমার পাঠককে আবিষ্ট ও অভিভূত করে।
তৃতীয়ত: উইট-এ থাকে শাসন আর ও চোখরাঙাণি। হিউমারে থাকে স্নেহমন্ডিত অনুযোগ।
চতুর্থত: উইট জীবনের খন্ডাংশের প্রতি আলোকপাত করে আর হিউমারের আবেদন জীবনের অনেক গভীরে।
পঞ্চমত: উইটের সমাদর বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে, বিশেষ শ্রেণীতে। আর হিউমারের সমাদর সকল দেশে সকল কালে এবং সকল শ্রেণীতে।

<u>স্যাটায়ার (satire) :</u> সমাজের দোষ, ত্রুটি, অন্যায়, দুর্নীতি ইত্যাদিকে বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করে হাস্যরসাত্মক ভঙ্গীতে গদ্যে বা পদ্যে লেখা কোন ব্যঙ্গাত্মক বা শ্লেষাত্মক বা বিদ্রূপাত্মক রচনাকে স্যাটায়ার বলে অভিহিত করা হয়। স্যাটায়ার শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘Satur’ এবং তা থেকে জাত শব্দগুচ্ছ ‘Lanx Satura’ থেকে। ইংরেজী ‘satire’ শব্দটি ল্যাটিন ‘Satura’ থেকে এলেও ‘Satirize’, ‘satiric’ ইত্যাদি শব্দগুলির উৎস কিন্তু গ্রীক ভাষা। ব্রেন লি (Brain Lee)-র ‘The Routledge Dictionary of Modern Critical Terms` গ্রন্থে ‘Satire’ শব্দটি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> ‘‘Satire is a genre defined primarily, but not exclusively, in terms of its inner form. In it the author attack some object, using as his means wit or humour that is either fantastic or absurd. Denunciation itself is not satire, nor, ofcourse, is grotesque humour, but the genre allows for a considerable preponderance of either one or the other.’’[৩৪]

অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে ‘Satire’কে একটি বিশেষ রীতি বলে সংজ্ঞায়িত করা হলেও অন্তর্নিহিত অর্থে এর আরো ব্যাপক দিক রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে লেখক উইট, হিউমার প্রভৃতির সাহায্যে কোন বস্তুর প্রতি আক্রমণ হানেন।

Claire Colebrook তাঁর ‘Irony` গ্রন্থে বলেছেন :

> "Satire focus on man: the human animal who may elevate himself through moral language but who, at bottom, is ultimately nothing more that a collection of desires and interest, a living and dynamic body rather than a timeless soul." [৩৫]

অজিতকুমার ঘোষ স্যাটায়ার প্রসঙ্গে বলেছেন :

> ‘‘যে হাসি আমাদের মুখকে প্রসন্ন না করিয়া বিষণ্ন করিয়া তোলে, যাহা আমাদের মন আমোদে উজ্জ্বল না করিয়া আঘাতে দীর্ণ করিয়া ফেলে তাহা ব্যঙ্গের হাসি। ব্যঙ্গকার বড় কঠোর, বড় নির্মম, তিনি মানুষের দোষ ও ব্যাধি নগ্ন করিয়া পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হইয়া ওঠেন। তাঁহার হাসি একক, দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে তাহা প্রতিধ্বনিত হয় না।’’[৩৬]

স্যাটায়ারের উদ্দেশ্য সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি যেগুলি সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক সে অসঙ্গতিগুলিকে দূরীভূত করে পরিণামে সমাজকে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়া। সমাজে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা দুর্নীতির বা কদাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলাও স্যাটায়ারিষ্টের উদ্দেশ্য। তবে এই উদ্দেশ্যমূলকতা সবসময়েই প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। কারণ উদ্দেশ্যমূলকতা যদি প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা যথার্থ শিল্পের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে উচ্চ শ্রেণীর স্যাটায়ারে যে বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয় এবং যে আঘাত দেওয়া হয় তা কোন ব্যক্তির প্রতি নয়। সেখানে বিদ্রূপবান বর্ষিত হয় কোন প্রথা, আচার, মতবাদ, সমাজ বা আইনকানুনের নানা অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করেই। লেখকের ব্যঙ্গবান যখন ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে ওঠে তখন তা নিম্নশ্রেণীর স্যাটায়ার বলেই পরিগণিত হয়। এমনিতে কৌতুক ও ব্যঙ্গ প্রকৃতিগতভাবে দুটি ভিন্ন বস্তু। কিন্তু হাস্যরসাত্মক সাহিত্যিক অদ্ভুত কৌশলে কৌতুক ও ব্যঙ্গকে মিশিয়ে দেন। এই দুইয়ের সঠিক মিশ্রণের ফলেই সার্থক হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। পরিমল গোস্বামী এ বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন :

> ‘‘ব্যঙ্গসাহিত্যে কিছু কৌতুকরস থাকা ভাল, যদিও আবশ্যিক নয় এবং হাস্যরসাত্মক গল্পে বা কৌতুক গল্পে কিছু ব্যঙ্গের খোঁচা থাকা ভাল। অর্থাৎ ব্যঙ্গকে হাস্যরস দিয়ে চেপে দিলে হাস্যরসাত্মক রচনা বেশি উপভোগ্য হয় এবং ব্যঙ্গ রচনায় কিছু কৌতুক

মিশিয়ে দিলে তা বেশি উপভোগ্য হয়। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কতখানি তার নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা তৈরি করা কঠিন।...

...দুটোতেই দুটো জিনিস থাকবে, কিন্তু কোনটা কত মাত্রার থাকবে তা ভেবে দেখা যাক। রঙ্গব্যঙ্গ সব মিলিয়ে ধরা যাক—এর এক চরম প্রান্তে জোর করে হাসানো, আর-এক চরম প্রান্তে লাঠির সাহায্যে অন্যায়কে আক্রমণ করা। একটি কৌতুক, অন্যটি ব্যঙ্গ—কিন্তু এর কোনওটাই ব্যঙ্গ সাহিত্য নয়। এর মধ্যস্থ যে স্থান, অর্থাৎ যে স্থানে আমরা হাস্যরসাত্মক সাহিত্য এবং ব্যঙ্গ সাহিত্যকে স্থাপন করতে পারি, সেই স্থানকে দশভাগে ভাগ করা যাক। এর প্রথমভাগ থেকে পঞ্চমভাগ পর্যন্ত হাস্যরসাত্মক সাহিত্য। তারপর থেকে অর্থাৎ ষষ্ঠভাগ থেকে দশম পর্যন্ত ব্যঙ্গ সাহিত্য। চতুর্থ ও পঞ্চমভাগে হাস্যরস বেশি উপভোগ্য এবং ষষ্ঠ এবং সপ্তম ভাগে ব্যঙ্গ বেশি উপভোগ্য। তারপর থেকে ব্যঙ্গ ক্রমে অত্যন্ত কষায় এবং শেষ ধাপে তিক্ত হয়ে ওঠে।''[৩৭]

স্যাটায়ারের হাসির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে :

১) স্যাটায়ারের হাসি জ্বালা ও যন্ত্রণা মেশানো।

২) সমাজের মধ্যে জমে থাকা অসঙ্গতিগুলিকে তীব্র বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে আঘাত করা হয় এই হাসিতে।

৩) এই হাসির পেছনে ব্যঙ্গকারের একটি সংশোধনী মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন থাকে।

বেশিরভাগ রাজনৈতিক কার্টুনগুলি যেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় সেগুলি স্যাটায়ারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কার্টুনগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে হাস্যরসাত্মক ভঙ্গীতে সমালোচনা করে। ইংরেজী সাহিত্যে Jonathan Swift-এর 'Gulliver's Travels` স্যাটায়ারের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এখানে Swift সমকালীন রাজনীতি, ধর্ম এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নানা অসঙ্গতিকে বিদ্রূপ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'নবদূতীবিলাস', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ব্যঙ্গধর্মী রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখসূচি :

১) কাব্যালোক, ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৮।

২) তদেব, পৃ. ৪৮।

৩) Laughter, Bergson, P-23. উদ্ধৃত: বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ টেমার লেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ.১৪।

৪) An Essay on laughter, P.93. উদ্ধৃত: তদেব, পৃ. ১৪।

৫) 'Leviathan`, Thomas Hobbes, উদ্ধৃত: তদেব, পৃ.১৬-১৭।

৬) এরিষ্টটলের পোয়েটিক্স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব, ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ২৩৮।

৭) বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, অজিত দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৮।

৮) ক)এরিষ্টটলের পোয়েটিক্স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব, ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ২৩৮-২৩৯।

খ) কালিদাস ও ভবভূতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সাহিত্য সং -সদ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৬৭৪।

৯) মাসিক বসুমতি, মাঘ, ১৩৫১।

১০) কৌতুক হাস্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চভূত, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃ. ৯৩২।

১১) মাসিক বসুমতী, মাঘ, ২৩ বর্ষ, ১৩৫১, পৃ. ২৯৬।

১২) কৌতুক হাস্যের মাত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চভূত, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভা- রতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃ. ৯৩৭।

১৩) তদেব, পৃ. ৯৩৭।

১৪) তদেব, পৃ. ৯৩৭।

১৫) তদেব, পৃ. ৯৩৮।

১৬) এরিষ্টটলের পোয়েটিক্স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব,, ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ২৪১।

১৭) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ টেমার -লেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ. ৩৫।

১৮) Gareth Griffiths, humours, A Dictionary of Modern Critical Terms, ibid, P.117. উদ্ধৃত : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, সুনীলকুমার রায়, পৃ. ৬৭।

১৯) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী

প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৩৭৫।

২০) তদেব, পৃ. ৩৭৫।

২১) ক)The Carlyle Encyclopedia, P-228, Edited by Mark Cumming. Source: https://books.google.co.in.

খ)The Carlyle Encyclopedia, P-228, উদ্ধৃত: বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ, টেমারলেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ. ২৮।

২২) The Carlyle Encyclopedia, P-228, Edited by Mark Cumming. Source: https://books.google.co.in.

২৩) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ টেমারলেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ. ২৮।

২৪) ক)সাহিত্য বিতান, মোহিতলাল মজুমদার, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-০৯, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় বিদ্যোদয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ২৫৪।

খ)কালিদাস ও ভবভূতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা৯, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৬৭৫।

২৫) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ টেমারলেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ. ২৮।

২৬) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৩৭৫।

২৭) তদেব, পৃ. ৩৭৫।

২৮) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ টেমারলেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ. ৩০।

২৯) M.H Abrams, A Glossary of Literary Terms, Reprint -2006, Macmillan, Delhi, P.159, উদ্ধৃত: মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, সুনীলকুমার রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা : ৭০০০০৯, পৃ. ৬৫।

৩০) বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, অজিত দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি পৃ. ২৮।

৩১) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ টেমারলেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ. ৩১।

৩২) তদেব, পৃ. ৩১।

৩৩) তদেব, পৃ. ৩০।

৩৪) The Routledge Dictionary of Modern Critical Terms`, Peter Child & Roger Fowler, P-211, 2006, Routledge Taylor & Francis Group, London & New York. Source : abs.kafkas. edu.tr/ upload/219/The-Routledge-Dictionary-of-Literary-Terms. উদ্ধৃত : মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, সুনীলকুমার রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা : ৭০০০০৯, পৃ. ৬৩।

৩৫) Claire Colebrook,Irony,Reprint 2009,Routledge Taylor & Francis Group, London and New York. p.139. উদ্ধৃত: মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, সুনীলকুমার রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা : ৭০০০০৯, পৃ. ৬৩।

৩৬) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮- এ টেমার লেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ. ৩২।

৩৭) সমগ্র স্মৃতিচিত্র, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩৫৯।